উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
পিএইচডি গবেষক ও সিনিয়র এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে ছোট্ট সবুজ শ্যামল ভূখন্ডে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। স্বাধীন হওয়ার পর একে একে ৪৮টি বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং তালিকায় শতকের মধ্যে স্থান করে নিতে পারেনি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলো কম-বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার কারণে কিছুটা অগ্রগতি হলেও কাংখিত বা আন্তর্জাতিক মানে পৌছায়নি। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-গবেষণা ছাড়া কোন জাতি এগুতে পারে না। একুশ শতক বিশ্বায়নের যুগ, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে মূলত সেই দেশের উচ্চশিক্ষার মানের ওপর। বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগ শুরু হয়েছে, মানসম্মত গবেষণা ও বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে পিছিয়ে থাকলে অন্যের উৎপাদিত পণ্যের ফেরিওয়ালা হয়েই খুশি থাকতে হবে, তাই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রযুক্তি ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। বিশ্বায়নের এ যুগে গুণগত শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনা। শিক্ষাই যেহেতু একটি দেশের উন্নয়ন বা আধুনিকায়নের চাবিকাঠি সে কারণে এ ক্ষেত্রটি জাতির নিকট সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ।

কেমন চলছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এর হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, এর বাইরে আরো দু'চারটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশে সব মিলিয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড়শতাধিক। নতুন জ্ঞান উৎপাদন ছাড়া এত বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী উপকার হবে? ইউজিসির ২০১৮ সালের হিসেব অনুযায়ী দেশের পাবলিক (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৩২১৮১৮২ জন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৩৬১৭৯২ জন এবং আন্তর্জাতিকসহ প্রায় ৩৭ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার যে চরম সংকট চলছে তা দিয়ে চাকরির বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন তরুন পাওয়া যাচ্ছে না। স্নাতক পাশ করে আসা চাকুরীপ্রার্থী সিংহভাগ তরুণ-তরুণীরা শুদ্ধভাবে দুই লাইন ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারেনা। এর সঙ্গে আছে যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা ও আইটি দক্ষতার ঘাটতি। নিয়োগদাতারা বলছেন, প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ খুঁজে না পাওয়ায় তাঁরা ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কান নাগরিকদের নিয়োগ দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের কাছে চিরকালই বড় সাহেব ও চাকরি পাওয়া এবং মান-মর্যাদার ব্যাপার হিসেবে গণ্য। যে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবতার যোগ নেই, সেই শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অচল হয়ে যাবে, বাস্তবতাবর্জিত শিক্ষার পতন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। দেশীয় প্রেক্ষাপটে ক্রমান্বয়ে আমরা মৌলিক গবেষণা ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্য জাতিতে পরিণত হচ্ছি। আবার বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট খুবই কম ও সীমিত। গবেষণা ব্যয় বাজেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট বাজেটের ১.৫/২.১ শতাংশ। এই বরাদ্ধ দিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়, বড়জোর ছোট-খাটো পিকনিক করা যেতে পারে। বিশ্ব বাজারের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত হচ্ছি পুরোনো ধাঁচের পাঠদান পদ্ধতি নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরুদের পাঠদান রীতি অনুকরণে শুধু পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়ানো নয়, কিংবা শ্রেণিকক্ষে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষকের কথা শোনা নয়। এ পদ্ধতি সম্পূর্নভাবে শিক্ষকনির্ভর হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি অর্জনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না। শিক্ষা ও গবেষণা খাতে অপ্রতুল বরাদ্ধ, সরকারের যথাপোযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার অভাব, গবেষণা বান্ধব উচ্চশিক্ষা কাঠামো ও পরিবেশ না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পর্যাপ্ত একাডেমিক ও মৌলিক গবেষণায় নেতৃত্বের আসনে না থাকায়, এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে এখন কার্যত

এগুলো ডিগ্রি ও সনদ উৎপাদন এবং বিক্রির কারখানায় পরিণত হয়েছে। তাই উচ্চশিক্ষায় প্রচলিত সনাতন পাঠদান ও মৌলিক গবেষণা পদ্ধতির পরিবর্তন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে।

মহাসঙ্কটে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান

মহাসঙ্কটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান, উচ্চশিক্ষার প্রবৃদ্ধি বাড়লেও দক্ষ জনবলের তীব্র সঙ্কট রয়েছে। মাছের পচন ধরে মাথায় আর জাতির পচন ধরে শিক্ষার মাধ্যমে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) তার ৪১ তম প্রতিবেদনে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বসেছে। সর্বত্র সমালোচনা ও তিরস্কার নিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কী ভয়াবহ দুর্দিন এটা নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন চলে আসা অনিয়ম ছাড়াও অনৈতিক ও কলঙ্কজনক ঘটনা অহরহ ঘটছে এবং এটি ন্যক্কারজনক পর্যায়ে পৌঁছে তীব্র ইমেজ সঙ্কটের মুখে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ। ইউজিসি এর ৪৩তম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৬৫ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয় না। নতুন নতুন উদ্ভাবন বা গবেষণার বদলে পাঠ্যবই, লেকচার শিট, মুখস্থনির্ভর ও চাকরিকেন্দ্রিক পড়ালেখায় আবদ্ধ। এই ব্যতিক্রমী শৃঙ্খলাবিহীন বা নামমাত্র রিসার্চ পেপার দিয়ে অগ্রগতির হিসাব কষলে পিছিয়ে পড়া স্বাভাবিক নয় কি? উন্নতবিশ্বে প্রাথমিক স্তরেই পিএইচডি বিহীন শিক্ষক হতে পারে না। সেখানে আমরা পিএইচডিবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হওয়ার সুবন্দোবস্ত রেখেছি। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির অতিরিক্তপনা আছে, গবেষণায় ঘাটতি আছে, বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছেনা, বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় নাম তুলতে পারছে না। এগুলোর সার্বিক মানের অবনমন ঘটছে বলে একটি নেতিবাচক ধারনা ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ শিক্ষা-গবেষণা বিষয়ক সেমিনার ও সভা-সমাবেশে একেবারেই সাধারণ মানের পিছনের সারির ছাত্রদের মত নিভু নিভু মোমবাতির আলোর মত জ্বলে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের বিদেশে এমফিল, পিএইচডিসহ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা হলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ দেশের সম্পন্ন করা শিক্ষাজীবনকে কমিয়ে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে দেশের শিক্ষার্থীদের এমফিল, পিএইচডি গবেষণার মানও নেই, মূল্যও নেই। পুনরায় মাস্টার্স না করলে এমফিল, পিএইচডি করা যায় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেধাবী ছেলে-মেয়েরা যখন দেশের বাহিরে যায় তখন যদি নিজেদের সেরাটা দেখাতে পারে, তাহলে দেশের মধ্যে শিক্ষার্থীরা কেন শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারবে না। শিক্ষার মান নিয়ে ন্যাকানি-চুবানি ইতিমধ্যে আমরা দেখতে শুরু করেছি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার গুণগতমান নির্ধারণ ও নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক মানদন্ড আছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)। উচ্চশিক্ষার এই মানোন্নয়ন প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ সবাইকে সম্পৃক্ত করা মূলত: এই সেলের কাজ। এছাড়াও সিলেবাস, কোর্স কারিকুলাম ও কো-কারিকুলার এ্যাক্টিভিটিস সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান ও শিক্ষা গ্রহণ প্রদ্ধতি কতটা মানসম্মত ও কর্যকরী হচ্ছে কি না, হলে গবেষণার গুণগতমান রক্ষা করা হচ্ছে কি না, দেশ বিদেশে মানসম্মত জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছে কি না, তা যাচাই ও মূল্যায়ন করে রিপোর্ট দিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার নিমিত্তে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত দায়িত্বপালন করছে কি না, সনদ ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের ডুকুমেন্টেশন সহ বহুবিধ কাজের তদারকি করবে এই সেল। যার প্রচলন আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় বিগত ৫/৭ বছর পূর্বেও ছিলনা, বর্তমানে চালু হলেও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অসহযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে সে ভাবে কার্যকর নয়। যদি এই আইকিউএসিকে সফল ভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়, তাহলে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী আন্তর্জাতিকীকরণ ও মানসম্মত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে স্বক্ষম হবে।

উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতে অন্তরায় সমুহ

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার অভাব ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নানা অরাজকতার মাধ্যমে

একটি সুবিধাভোগী গ্রুপ তৈরী হয়ে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর দলদাসে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকটের সুযোগে গড়ে উঠছে গণরুম প্রবনতা, গেস্টরুম সংস্কৃতি। ফলে নিরীহ, অসহায় ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাবশালী রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের টর্চারসেল, মাস্তানী, নির্যাতন, নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অবরুদ্ধ করা সহ এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। যা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন মুক্তচিন্তা বিকাশের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু বর্তমানে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দাঙ্গাহাঙ্গামা, গুম-খুন, ছিনতাই-রাহাজানি অপহরণ, ধর্ষণ, ছাত্র-শিক্ষক হত্যা, টেন্ডারবাজি লুটসহ এমন কোন জঘণ্য সামাজিক অপরাধ নেই যা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সংঘটিত হচ্ছে না। সামগ্রিকভাবে আমাদের উচ্চশিক্ষা ধসের ক্ষতিকর দিক ও করুণ চিত্র তালাশ করলে যে সমস্ত সমস্যা খুঁজে পাই তা হল:

১. অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা।
২. বিশ্বমানের সিলেবাস বা কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচির দুর্বলতা।
৩. সেশন জট ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণে ব্যর্থতা।
৪. ভর্তি ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটি।
৫. মানসম্মত ভালো পাঠ্য বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা।
৬. মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগারের পাঠপোকরণ ও গবেষণাগারের অপার্যাপ্ততা।
৭. মেধার মূল্যায়নে পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থায় দূর্বলতা।
৮. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতের অসঙ্গতি।
৯. শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা।
১০. ছাত্র-শিক্ষক নির্বাচনে দলা-দলি, অস্বচ্ছতা ও রাজনীতির মন্দ প্রতিক্রিয়ার কারণে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য কেন্দ্রিক ক্যাম্পাস।
১১. দলীয় ও আত্মীয় করণের অভিশাপের ফলে বৈধ-অবৈধ উপায়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ, অথচ দক্ষ ও সৎ শিক্ষকের দারুণ অভাব।
১২. শিক্ষকদের অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা ও বেতন ভাতা।
১৩. উচ্চশিক্ষায় অর্থ সংকট ও গবেষণা খাতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ।
১৪. শিক্ষাপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় ব্যাপক দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়।
১৫. শিক্ষক নিয়োগে মেধার পরিবর্তে রাজনীতি ও স্বজনপ্রীতি।
১৬. রাজনৈতিক সন্ত্রাস, খুন, বিচারহীনতার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয় অচল বা বন্ধ থাকা।
১৭. অধিকাংশ শিক্ষককের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির নলেজ না থাকা।
১৮. ডিগ্রী অর্জন বা সার্টিফিকেট মুখী শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে দৈন্যতা।
১৯. ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বির্বজিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও সহ শিক্ষার কুফলে অবাধ যৌনাচার।
২০. উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক অ্যাসিস্ট্যান্ট না থাকা।
২১. বছর শেষে শিক্ষককের মূল্যায়নের ব্যবস্থা অনুপস্থিতি।
২২. পরিপূর্ণ ও হালনাগাদ সিনেট সিন্ডিকেট না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ৭৩ সালের অর্ডিন্যান্সের অপব্যবহার করা সহ ইত্যাদি কারণে গুণগত মান তৈরীতে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

মানসম্মত উচ্চশিক্ষায় করণীয় কী?

উচ্চশিক্ষার সমস্যাটি হলো মানের, গুণের, মেধার, চিন্তার, যা শিক্ষার কোনস্তরেই নিশ্চিত করা যায়নি। আমরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলছি। শিক্ষার জোয়ারে ও বন্যায় দেশ আজ ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা কী শিক্ষা পেলেন, এই শিক্ষা নিয়ে কর্মজীবনে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন কি না? সেসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা আগেও ছিল না এখনো নেই। বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞান চর্চার জায়গা। এখানে যুক্তি, তর্ক ও গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন আবিষ্কার বেরিয়ে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতিকে স্বপ্ন দেখাবে পথের দিশা দেবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় রাজনীতি চর্চায় যতটা সক্রিয় জ্ঞান চর্চায় ততটা উদাসীন ফলে শিক্ষার পরিবেশ ক্রমান্বয়ে কলুষিত হচ্ছে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টি বছরের পর বছর উপেক্ষিত হওয়ায় পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। ভর্তি ও পাশের হার বাড়লেও সঙ্কটে আছে শিক্ষার মান। আমাদের উচ্চশিক্ষার মান অনেকখানি পড়ে গেছে এবং সম্ভবত এটি ক্রমাগত নিম্নমুখী। উন্নত বিশ্বে উচ্চশিক্ষা সীমিত তাই কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প কারিগরি শিক্ষাধারা প্রবর্তন করে বিশাল মানবসম্পদকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করা। শিক্ষিত লোকেরাই প্রতিটি দেশের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে আসীন থাকেন, এ কারণে একটি

দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৎ না হলে ঐ দেশের কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বছরে পর বছর ছাত্রছাত্রীদের পাস করাবে না বরং সমাজের প্রতি সামাজিক উন্নয়নে তাদের কিছু দায়বদ্ধতা অবশ্যই থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে এমন একটি সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্র যেখানে মানবতার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হবে এবং তার সঠিক সমাধান খুঁজে বের করা হবে। শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভবিষ্যৎ ও নতুন প্রজন্মকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি দিয়ে মাথা ভর্তি করে দিলেই হবেনা। তাদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ভাল মানুষ তৈরী করতে হবে। সততা, নিষ্ঠা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নিবেদিতপ্রাণ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও ধারণা করা হচ্ছে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ স্বয়ংক্রিয়তা, রোবট, ইন্টারনেট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে ৮০ কোটি মানুষের কাজ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে, নতুন ১০০ কোটি মানুষের কাজও সৃষ্টি হবে, তবে সেগুলোতে শ্রমের চেয়ে মেধার প্রাধান্য থাকবে বেশী। বিষয়টি মাথায় রেখে মানসম্মত গবেষণা ও শিক্ষা অর্জনে বিশ্বব্যাপী জাতিগুলো তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে। এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নজর দিতে হবে। অন্যথায় কোন পরিবর্তন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং নিয়ে নানামুখী সংকট, প্রয়োজন গভীর উপলব্ধি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চলছে না একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বায়নের ব্যাপার থাকে। যেখানে বিদেশী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী থাকবে, মাল্টিকালচারাল ব্যবস্থা থাকবে, শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও প্রকাশনা থাকবে। বর্তমানে বিসিএস নির্ভর পড়াশুনা গবেষণার অন্যতম অন্তরায়। বিসিএস চাকুরেদের সুযোগ-সুবিধার ছিটেফোঁটাও নেই, গবেষণা বিষয়ক চাকুরিতে। আবার ছাত্র-শিক্ষকদের যোগ্যতার পরিবর্তে রাজনৈতিক পরিচয়ে চাকুরি ও পদ-পদবী মিলে। রাজনীতি ও গবেষণা দুটার জন্যই সময় দিতে হয়। তাই এই দুটো একসাথে চলে না। তাঁরা যদি দেখেন রাজনীতি করলে বিভিন্ন পদ-পদবী পাওয়া যায় এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। আর উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় একজন প্রফেসর হওয়ার পর তাঁর আর কোন প্রমোশন বা আর্থিক সুবিধা নেই। তাহলে কেন তাঁরা রাত জেগে না ঘুমিয়ে কষ্ট করে গবেষণার পিছনে এত সময় ব্যয় করবেন। একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশনা উপযোগী আর্টিকেল লিখতে হলে কমপক্ষে ৪০০ থেকে ৫০০ কর্মঘন্টা বা তার চেয়েও অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। তাহলে কেন তাঁরা গবেষণার মত এত কষ্টের কাজে মনোযোগী হবেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সেকেলের অগোছালো নৈতিকতা বর্জিত শিক্ষা পদ্ধতি ও গবেষণাবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যায়নে পিছিয়ে পড়েছি আমরা। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে উচ্চশিক্ষার মানের দিক দিয়ে ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ২৯তম ও ৪০তম! এটি সত্যিই উদ্বেগজনক চিত্র। শিক্ষার মানের চিত্রটা আসলে কী, এ প্রশ্নে উদ্বিগ্ন দেশের জনগণ, শিক্ষাবিদ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা, এমনকি খোদ শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারপ্রধানও। অধিকাংশের ধারণা হচ্ছে, শিক্ষায় সংখ্যাগত বিস্তৃতি ঘটলেও প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার মানে বিরাজ করছে অরাজকতা। শিক্ষার মান বিচারে এশিয়ার সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। আর বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উচ্চশিক্ষার গুণগতমানের অবস্থা তলানিতে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে কেরানি বানানো কিংবা পাকিস্তান আমলে আমলা তৈরীর যে শিক্ষা ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে তারই অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণ যুগ যুগ ধরে চলছে। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বিশ্ব বা এশিয়া ভিত্তিক বেশকিছু সংস্থা ৪০০/৫০০ মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং বা ক্রমতালিকা প্রকাশ করলেও বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সেই তালিকায় স্থান হয় না। কেন আমরা র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে আছি। কীভাবে র‍্যাঙ্কিং করা হয়, র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার উপায়ই বা কী ? এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর বা কৈফিয়ত খুঁজতে হলে খুব গভীরে যেতে হবে, তবে একটি কথা অব্যশই বলা যায় যে নিশ্চয় সংস্থাগুলো কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা সূত্র ব্যবহার করে এই র‍্যাঙ্কিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এই র‍্যাঙ্কিং ফর্মুলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে আলোচনা করা হল। যথা:

১. পাঠদান ও শিক্ষা গ্রহণ প্রদ্ধতি কতটা মানসম্মত ও কার্যকরী।

২. সিলেবাস, কোর্স কারিকুলাম ও কো-কারিকুলার এ্যাক্টিভিটিস কীভাবে হয়।

৩. শিক্ষকদের যোগ্যতা, ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপাত কি রকম, ক্লাস আওয়ার কতটুকু বিবেচনায় আনা হয়।

৪. এমফিল, পিএইচডি কোথা থেকে করা হল তার বিষয়বস্তু কী ও ডিগ্রীধারী শিক্ষক-কর্মকর্তার সংখ্যা, কর্মক্ষেত্র সাফল্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবদান ও গবেষণাগুলোর সাইটেশন কেমন।

৫. গবেষণাকর্মের বানিজ্যিকীকরণ ও এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য ও বার্ষিক আয়ের পরিমান।

৬. আন্তর্জাতিক উপস্থিতি (ছাত্র-শিক্ষক), জ্ঞান আদান-প্রদান ও বিনিময়ের হার।

৭. সুনাম ও পরিচিতি জরিপের রেপুটেশন সার্ভে।

৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের পরিমান, এক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণা বাজেটের অনুপাত কত।

৯. আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা আর্টিকেল প্রকাশনার পরিমান কত? এবং শিক্ষক ও গবেষকদের মাথা পিছু প্রকাশনা কয়টি।

১০. শিক্ষার পরিবেশ বান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থা আছে কি না, গ্রন্থাগারে পাঠ উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা কেমন রয়েছে।

১১. অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্যসমৃদ্ধ ভালো কার্যকর ওয়েবসাইট শতভাগ আপডেট করা হয় কি না।

আর এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া বা শর্তগুলো পালনে বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হয়তো ধারে কাছেও নেই। যার কারণে ওয়ার্ড র‍্যাঙ্কিং থেকে ছিটকে পড়েছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কাঠামো। সব হিসেব কষে কী মনে হচ্ছে? আমরা কি আদৌও এইসব র‍্যাঙ্কিং ধারে কাছে যাওয়ার যোগ্যতা রাখি? মোটেও না। কিন্তু এর কোন বিচারেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উত্তীর্ণ হবে না। তাই নিজেদের মর্যাদা নিজেরাই হারাচ্ছি, যার ভবিষ্যৎ রূপরেখা হবে ভয়াবহ ।

উচ্চশিক্ষা মান নিয়ে জাতির প্রত্যাশা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞান সৃষ্টি করা (To create knowledge)। যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি করা হয় না, তাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না। কথায় আছে, বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়। ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কেমন হবে সেটি তার গবেষণা পরিচয় দিবে। জ্ঞান নির্ভর তথ্য-প্রযুক্তি ও উন্নত অর্থনীতির যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির সাদামাটা পাঠদান ও সনদ প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই। জাতির প্রত্যাশা হলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উচ্চশিক্ষার গুণগতমানে সকল শঙ্কা, দৈন্যতা, নেতিবাচক ধারণা ও ইমেজ সঙ্কট কাটিয়ে মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং তালিকা থেকে ছিটকে না পড়ে বাংলাদেশের অন্তত দু'চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং তালিকায় শতকের মধ্যে স্থান করে নিবে। তাই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়বদ্ধতা হলো নিরলস জ্ঞানচর্চা, অর্জিত জ্ঞান অধ্যয়ন, বিতরণ, নিত্য-নতুন বহুমুখী গবেষণার ভেতর দিয়ে আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উদ্ভাবন, ই-সার্ভিস ও ডিজিটালাইজেশনসহ জ্ঞানের অনুসন্ধান ও ক্রমসম্প্রসারণ করে সমাজ ও জাতিকে কর্মচঞ্চল জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা। একটি দেশ কখন বড় হয়? যখন দেশটি শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যায়। যে শিক্ষা যুগের চাহিদা মেটায়, অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করে, মানবিক বোধের বিকাশ ঘটায়, নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়ে একটি সুদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করে। তাই দ্রুততম সময়ে সবকিছুর লাগাম টেনে ধরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী।